ভোলানাথ ও মা।
পূর্বেকার মত বাঁ হাতখানি উঠাইলাম। (পৃষ্ঠা ২০৪)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভোলানাথের সাহবাগে বদলী

একদিন ঢাকা বড় কাছারি হইতে হঠাৎ খবর আসিল ভোলানাথকে বাজিতপুর হইতে সরিতে হইবে। ভোলানাথ ব্যস্ত হইয়া এ শরীরকে নিয়া ঢাকা গেল। তথায় কোন সুবিধা করিতে না পারিয়া আমাকে অন্যত্র পাঠাইবার স্থির করিতেছে এমন সময় এ শরীর বলিল — আরো তিন দিন অপেক্ষা কর — দেখ কি হয়। এ তিন দিনের ভিতরই ভোলানাথের সাহবাগে চাকুরীর বন্দোবস্ত হইল। আমাদের তখন (২৮শে চৈত্র ১৩৩০) ঢাকা গিয়া কিছুদিন পরই (৩রা বৈশাখ ১৩৩১) সেই বাগানে চলিয়া যাওয়া হইল।

সাহবাগে যাইবার কিছু দিন পর ভোলানাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম — এখানে সিদ্ধেশ্বরী আছে দেখিতেছি। সে নামের কোন গাছ আছে কি ? ভোলানাথ সাহবাগের নিকটবর্তী বুড়াবুড়ী তলায় কয়েকটি বড় বড় গাছ দেখাইল। বলিলাম — এইসব নয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় আরতি দেখিতে নিকটস্থ রমনা কালীবাড়ী যাইতাম। কালীবাড়ী হইতে একরাত্রি ফিরিবার সময় ভোলানাথের পুরান বন্ধু বাউল চন্দ্র বসাক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহার সহিত কথায় কথায় সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর খবরাদি জানা গেল। ভোলানাথ তাহাকে বলিয়াছিল সে যেন এক সময় আমাদিগকে তথায় লইয়া যায়।

একদিন আষাঢ় মাসে আমি, ভোলানাথ ও বাউল সহ সিদ্ধেশ্বরী গেলাম। যাইয়া দেখি মন্দিরের গেটে ঝড়ে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ গাছ হেলিয়া রহিয়াছে। এ শরীর বলিয়া উঠিল — এ স্থান ও এ গাছই সাহবাগে থাকাকালীন দেখিয়াছিলাম কিন্তু এখানে নিশ্চয় পূর্বে আরো গাছ ছিল। তখন বাউল কহিল — হ্যাঁ, প্রবাদ আছে, বট, অশ্বত্থ ও চন্দন এ তিন বৃক্ষ একত্র হইয়া একটি গাছে পরিণত হইয়াছিল এবং উহা তিন্তিড়ী বৃক্ষ নামে পরিচিত হইত। আমি জানিলাম উহাই সেই সিদ্ধেশ্বরী গাছ। বাউল বলিল — সেই বৃক্ষে জ্যোতি দর্শন হইত এবং ইহাতেই সিদ্ধেশ্বরী কালীর জ্যোতির্ময়ী রূপে অধিষ্ঠান

সংজ্ঞাহীনের মত হইয়া আছে। মা বলিলে এ শরীর তাহাকে ধরিয়া তুলিল। সুরবালা বলিল — আমি এতক্ষণ কোথায় যে ছিলাম মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। তখন মা ভাবিলেন তাহার অসুখ সারিবে না। এ শরীরও তাহাই ইঙ্গিত করিল।

সুরবালা আর বেশী দিন নাই, ইহা ত জানিতাম, সেই খেয়ালে এ শরীরের একটা কান্না কান্না ভাব ক্ষণিকের জন্য প্রকাশ পাইল। পরে বিচারে আসিল — এইসব ত তাঁহার খেলা। শরীরবোধ জনিত দুঃখ মাত্র। দেখিলাম কান্নার ভাবটা যেন বাতাসে মাথার চুল উড়াইবার মত বাহিরেই প্রকাশ পাইতেছিল। ক্ষণিক জাগতিক হিসাবে মানুষের মনের ভিতর বন্ধনের ভাবগ্রন্থিতে সংস্কারগুলি আটকান থাকে এবং সময়োচিত শরীর নিয়াও খেলা করে। ঘাম বাহির হইলে যেইরূপ শরীর ক্ষণিক ঠাণ্ডা বোধ হয়, তদ্রূপ অশ্রুপাত, হাসি ইত্যাদির দ্বারা ভাবগ্রন্থি শিথিল হইলে ভগবানের জন্য প্রকৃত কান্না বা প্রকৃত হাসি বাহির হয়। জড়তার দরুণ এ সব গ্রন্থির কাজ সাধারণের উপর থামিয়া থামিয়া হয়। তাই তাহাদের কান্না বা হাসি বেশীক্ষণ চলিতে পারে না এবং বন্ধনভাবও সহজে কাটে না।

সাধনার একমুখী অবস্থায় হাসি বা কান্নার কোন কারণ আসা মাত্রই প্রবল বেগে সাধককে অভিভূত করিয়া আবশ্যকীয় সময় চলিয়া ভাবগ্রন্থি খুলিয়া দেয়। যাহাদের উচ্চাবস্থা তাহাদের সকল গ্রন্থি খোলা থাকে। হাসিকান্না একই ভাবে তাহাদের শরীর দিয়া অস্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পাইতে পারে এবং কখনো কখনো রৌদ্র ও বৃষ্টির মত যুগপৎ খেলিয়া যায়। এ শরীরে সকলের জন্যই হাসি বা কান্নার ধারা একই সমান।

একদিন মায়ের খুব জ্বর হয়। বাক্‌বন্ধ অবস্থায় ১২/১৩ দিন যাবৎ তাহাদের সংসারের সব কাজ কর্ম এ শরীরকেই করিতে হয়। মা'র অবস্থা খারাপ দেখিয়া এ শরীরের পিতা একদিন বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া আছেন, এ শরীরটা তাঁহার মলিন মুখ দেখিয়া মা'র নিকটে গিয়া কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মা সেইদিন হইতে ভাল হইতে লাগিলেন।

বাবা ভোলানাথ, মা ও সরণী

দেখাইত। ঐ বৃক্ষ হইতে সময়ে সময়ে জ্যোতি মন্দিরে যাইত, আবার মন্দির হইতে গাছে আসিত ইত্যাদি। ঐ যে জ্যোতি জ্যোতির্ময়ী কালী রূপে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী নামে আছেন।

সাহবাগে মৌনাবস্থায় দিন কাটিতেছে। একদিন স্থানীয় এক ভদ্রলোকের পরিবার ছেলেপিলে নিয়া তথায় বেড়াইতে গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিতেছে — কি সুন্দর চেহারা কিন্তু এটি বোধ হয় বোবা, তাহা না হইলে কথাবার্তা বলে না কেন? তাহারা কি খাইতেছিল। এ শরীর গিয়া তাহাদিগকে একটু নুন দিল। তখন তাহারা বলিল — আমরা ত বলি নাই কেমন করিয়া বুঝিল যে নুন দরকার, আবার দেখি হাসিতেছে। আহা! কানেও বোধ হয় শুনিতে পায় না। পরে তাহারা চলিয়া গেল এবং বাড়ীতে গিয়া এ সম্বন্ধে গল্প করিল।

তাহাদের ভিতর বয়স্করা পরে অনুসন্ধান করিয়া এ শরীরের অবস্থাদি জানিয়া তাহাদের বাড়ীর একটি আট বছরের পীড়িত ছেলেকে লইয়া সাহবাগ আসিল। তাহার অচলাবস্থা। তাহাদের অন্য আর একদিন আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। সেইদিন ছেলেটি আসিলে, এ শরীর তাহাকে দেখিবামাত্র কোলে আনিয়া বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। ছেলেটি চুপ করিয়া রহিল। পরে সকলে চলিয়া গেল। শুনিলাম, তাহার অসুখ সারিয়া গিয়াছিল। সে একদিন সাহবাগ আসিয়াছিল, দেখিলাম খুব ছুটাছুটি করিতেছে।

সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীতে সাত দিন

সেই ভাদ্রমাসে আবার সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী যাইবার জন্য ব্যবস্থা হইল। সন্ধ্যার পূর্বে ভোলানাথের সহিত সিদ্ধেশ্বরী গিয়া সেখানে অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীকে ভোগ নিবেদন করা হইল। এইরকম ত আগে নিবেদন করা হয় নাই কিন্তু ভোলানাথ বলিল, ভিতর হইতে তোমার যে ভাব আসে, সেইরূপে নিবেদন কর। তাহাই করিলাম। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। তাহার পরদিন তথায় রহিলাম। দিনে এ শরীরের পিতা সিদ্ধেশ্বরী থাকিতেন, ভোলানাথ সন্ধ্যায় আসিয়া রাত্রি কাটাইত। ২/৩ দিন গেলে বাউলও

রাত্রিতে আসিয়া থাকিত। এ শরীর সে সময় কালীর আসনের সংলগ্ন একটি খালি কুটুরীতে একাই থাকিত। ভোরে স্নানাদি করিয়া সেই কুটুরীতে প্রবেশ করিত এবং সারাদিনরাত্রি বিনা শয্যায় একবস্ত্রে শরীরটা আপনভাবে মাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখনো বা চুপ করিয়া-বসিয়া থাকিত। কচিৎ কখনো মন্দিরের ভিতরে হাঁটিয়া বেড়াইত। কেবল রাত্রে একবার বাহিরে আসিয়া কালীকে ফলাদি নিবেদন করিয়া অতি সামান্য কিছু গ্রহণ করিবার পর, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার কুটুরীতে ফিরিত। এইরূপে ৭ দিন কাটিবার পর রাত্রি শেষে নিবেদিত ফলাদি গ্রহণ করিয়া ভোলানাথকে বলিলাম — চল আমরা বাহিরে যাই এবং বর্তমান আসনে, যেখানে মহাদেব স্থাপিত হইয়াছে সেখানে গেলাম। মন্দিরের দুয়ারে বাউল সমস্ত রাত্রি হইতে বসিয়া আছে, কিন্তু ভোলানাথের সহিত আসিবার সময় কোন সাড়া পাইলাম না। পূর্বোক্ত স্থানটি জাগতিক ভাবে এই আমার প্রথম দেখা। উহা একটি ছাড়া জায়গার মত, উহার নিকটেই একটি উইয়ের ঢিবী এবং একদিকে ঐ স্থানের অর্থাৎ নীচের দিকে একটু দূরে বর্ষার জলে ভরা। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; ভোলানাথ সহ তথায় ভিজিতে ভিজিতে গিয়া এ শরীরটা তিনবার ঘুরিয়া যেখানে একটু উঁচু স্থান তাহার মাঝখানে (যেখানে বর্তমান শিব স্থাপিত আছে) চ্যাপটা করিয়া ডান হাত রাখিয়া মাটির উপর চাপ দিয়া বসিল। দেখি সমস্ত হাতটি যেন মাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া কাঁধ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ভোলানাথ বলিয়া উঠিল — এ কি! সবই যে ভিতরে চলিয়া যাইতেছে। এ বলিতে বলিতে আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিল। হাত তুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোয়ারার মত লালচে রঙের উষ্ণ জল খুব বেগে উঠিয়াছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেলে ভোলানাথ চল চল করিয়া তাড়াতাড়ি কালীবাড়ীতে নিয়া আসিল।

যখন হাত ভিতরে চলিয়া গিয়াছিল তখন কি একটি জিনিষ হাতে ঠেকিয়াছিল, উহা তাহার মধ্য হইতে হাতে করিয়া উঠাইয়াছিলাম এবং সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ীর সংলগ্ন পুকুরে ভোলানাথ তাহা ফেলিয়া দিল। পরের দিন সাহবাগ চলিয়া আসা হইল।

তিন দিন পর কয়েকটি দ্রব্যের ক্রিয়ার দ্বারা ঐ হস্তচিহ্নিত স্থানটি বুঝাইয়া আসিবার জন্য বাউলকে বলা হইয়াছিল এবং স্থানটি যাহাতে

ঠিক রাখা হয় তাহার ব্যবস্থাও করিতে বলা হইল। পরে খড়ের ঘর হইলে চারিদিকে ভিটি উঁচু করাতে সে স্থানটি একটি চতুষ্কোণ কুণ্ডের মত দেখাইত। পরে টিনের ঘর হইবার পর উহা বুজাইয়া, পূর্বোক্ত কুণ্ডে এ শরীর হাঁটু গাড়িয়া বসিলে যতটুকু হয় ততটুকু একটি স্তম্ভ করা হইল। পরে সে স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে।

আহারের পরিবর্তন

আষাঢ় মাসে এই শরীরের খাওয়ার এক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গেল। একদিন খাইতে বসিয়া দেখি কি, তিনবারে তিন গ্রাস যাহা হাতে উঠিয়াছিল, মাত্র ততটুকুই খাওয়া হইল। তাহার পর হইতে এইরূপই চলিতে লাগিল। কয়েক মাস পর্যন্ত এই ভাবেই চলিয়াছিল। দিনে একবার, রাত্রিতে একবার মাত্র খাওয়ার নিয়ম ছিল। খাওয়ার সময় ভিন্ন অন্য সময় জলও খাওয়া হইত না। সংসারের কাজকর্ম সবই করা হইত। অন্নের বদলে যেদিন ফলাদি খাওয়া হইত সেদিনও তিনবার মাত্র মুখে দেওয়া হইত। অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহার বেশী মুখে যাইত না।

কুশারী মহাশয়ের সহিত কৌতুক লীলা

আবার জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন — যতক্ষণ 'আমার' ও 'তোমার' এই ভাব, ততক্ষণই ব্যবহার। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যবহারটাও চলিয়া গেল। আপনার বাছিয়া বাছিয়া কথা, ভদ্রতা প্রকাশ করা, এইসব ভাব, ব্যবহার একেবারে নির্মূল দেখিয়া এ শরীরের জাগতিক সম্বন্ধীয় আত্মীয় কুটুম্বরা দুঃখ করিত — আপনি যেন সকলের হইয়া গেলেন। আমরা আপনাকে আর পূর্বের মত পাই না। এখন যেন সকলে আপনাকে নিয়া গেল।

ভোলানাথের ভগ্নীপতি (কালী প্রসন্ন কুশারী) ঢাকা আসিয়াছেন। কথায় কথায় বলিলেন — সব সময় দেখি যে আপনি কোথায় কী একভাবে যেন থাকেন। আপনার কথাবার্তা আমরা পাই না, মাত্র শরীরটা দেখি। বলুন ত আপনি কোথায় থাকেন? এ শরীর হাসিয়া বলিল — কেন, এক জায়গাতেই ত আছি। সবই ত এক।

কোথায় আর যাওয়া আসা? তিনি বলিলেন — আমরা এত বড় কথা বুঝি না। আপনি কেবল আমাদের হইয়া আগের বউটির মত ব্যবহার ও আলাপাদি করুন ত। এ শরীর বলিল — কেন, আপনার কাছে বসিয়াই ত এ শরীর বউ ব্যবহারে চলিতেছে। তিনি বলিলেন — আমরা আপনার আদরযত্ন সবই পাই; কিন্তু তবুও যেন মনে হয় আপনাকে পাই না। আমাদের থেকে আপনি যেন সকল ভাবেই আলাদা। এ কারণে আপনাকে আমরা পাওয়া সত্ত্বেও অভাব বোধ করি।

আবার জিজ্ঞাসা করিলেন — আপনার যে এইরূপ অবস্থা, ইহা কি করিয়া হয়? বলা হইল — দেখুন, যদি একটি মঠের চূড়া সহ সম্পূর্ণটা দেখিতে হয়, তবে নীচে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া দূর হইতে উর্ধ্ব দৃষ্টিতে তাকাইতে হয়, তবেই মঠটি সম্পূর্ণ দেখা যায়। পরে মঠে যাইয়া বিগ্রহাদি দর্শন এবং যদি কাহারও ঠিক ঠিক বিগ্রহ স্পর্শ হয়, তবে পরশমণি স্পর্শের মত সেও তাহারই মত হইয়া যায়। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন — আচ্ছা! আপনার যে অবস্থাটি দেখা যায়, সেই অবস্থাটি কি রকম? বলুন ত। এ শরীর বলিল — আমাকে একটি কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন? এই যে সামনে ফুলটি দেখিতেছেন ইহা আপনার কাছে কেমন সুন্দর লাগে? আর ইহার উপর আপনার কেমন ভাব? তিনি চুপ হইয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, তাঁহার স্নেহ এ শরীরের উপর বাড়িয়াই গেল। যে কয়দিন তিনি ঢাকা ছিলেন এ সব আলোচনাই হইত।

পূর্বে তিনি একবার ঢাকা আসিয়াছিলেন, তখন এ শরীরের কথা বন্ধ ছিল। কেবল কুণ্ডলী দিয়া কথা হইত। সে সময় তিনি এই শরীরের সঙ্গে খুব ঠাট্টা তামাসা করিয়াছিলেন। প্রথম ভোলানাথকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন — কোথায়, দেবতা কোথায়? এ শরীরের কাছে আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন — আপনি যে তিন গ্রাস খাইয়া থাকেন, এক এক পোয়া চাউল দিয়া এক এক গ্রাস নাকি? এ শরীর কিছুক্ষণ পর কুণ্ডলী দিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত ধর্ম-সম্বন্ধীয় ও এই শরীরের অবস্থা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় কথা হইল।

ইহার মধ্যে তিনি বলিয়া উঠিলেন — অনেক বেলা হইয়াছে, খেয়ালও নাই। আচ্ছা! আপনার যদি শক্তি থাকে আমাকে ভস্ম

করুন ত। এই বলিতে বলিতে খুব হাসিলেন এবং রওনা হইলেন। এ শরীরও উঠিল। তিনি সেইবার সহরে অন্যত্র ছিলেন। এ শরীরের ও ভোলানাথের সেই সময় সহরে যাইবার কথা ছিল। তিনজনেই এক সঙ্গে বাহির হইলাম।

আমরা শাহবাগে আসিয়া অবধি দেখিতেছি, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার এই বাগানে যে দুইটি কবর আছে, সেইখানে এক মুসলমান মালি ধূপ ও সিন্নি দেয়। উপরে যেদিনকার কথা বলা হইতেছে, সেই দিনও বৃহস্পতিবার ছিল। আমরা বাহির হইবার সময় সেই মুসলমানটি আসিয়া আমার নিকট হইতে কয়েকটি ধূপকাঠি নিয়া গেল। কুশারী মহাশয়ও কয়েকটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া হাতে লইয়া সুন্দর গল্প করিতে করিতে চলিলেন। বেশ অনেকটা দূর আমরা বড় রাস্তার উপর দিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলাম। খুব রৌদ্র। তিনি তাঁহার ছাতাখানা নিয়া এ শরীরের মাথায়ও ধরিলেন। এক ছাতায় দুইজন চলিতেছি। ভোলানাথ রাস্তার অপর দিকে। ইহার মধ্যে হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন। আরে! আগুন কোথা হইতে মাথায় পড়িতেছে? আমাকে ভস্ম করিতেছেন নাকি? সত্যিই আপনার শক্তির পরিচয় খুব হইয়াছে আর আমাকে ভস্ম করিবেন না। ইহা বলিতে বলিতে ছাতাখানার দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে ছাতাটি খানিকটা পুড়িয়া আগুন মাথায় পড়িয়াছে। আগুন কিরূপে লাগিল ইহার অনুসন্ধানে তাহাদের মনে হইল — ভস্ম করিবার কথা নিয়া ঠাট্টা করিতে করিতে তিনি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া হাতে করিয়া নিতেছিলেন, সেইগুলিতে হয়ত ছাতার কাপড় পুড়িয়া আগুন তাহার মাথায় পড়িয়াছিল।

সাধকের কর্তব্য

এ শরীরটা — সংসারে বৌ সাজিয়া যেমন সেবা কর্মাদিতে থাকিত আবার সাধক সাজিয়া ঐ অনুযায়ী ভাব প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। এ শরীরের খেয়ালে আসিল তাই সাধকের খেলা আরম্ভ। ভিতরে জিজ্ঞাসা আসিল — মানুষের কি করিয়া ভগবান লাভ হয়? সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও আসিল — ইহার জন্য ব্যাকুলতা চাই। তাই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সর্বদা তাঁহার জন্য একটি পরাণ

পোড়া আকুল চিন্তার ধারা রাখা দরকার। যেমন সোহাগিনী স্ত্রীলোক সর্বক্ষণ সর্ব ব্যাপারের ভিতরেও আপনার শাঁখা, সিন্দূর ও লোহার প্রতি দৃষ্টি রাখে, শোকের ভিতরও যেমন লোকে পরণের কাপড়টি গুছাইয়া রাখে, যেমন মুখে পান চিবাইতে চিবাইতে সংসারের কাজ-কর্ম চলিতে থাকে, অথবা যেমন সন্তান কোলে করিয়া জননী সংসারের কাজকর্ম করে, এইরূপ ভাবে সংসার যাত্রার ভিতরেও ভগবানের নাম ও চিন্তার ধারা প্রতি মুহূর্তে স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। কোন সময় কাজের ভিড়ে ভুলিয়া গেলে, মনে আসিবামাত্রই বিশেষ অনুতপ্ত হওয়া আবশ্যক যে — ঠাকুর! এতক্ষণ তোমাকে ভুলিয়া-ছিলাম। তাহা হইলে ভগবৎ চিন্তা দিনে দিনে বাড়িতে থাকিবে। মনে রাখিতে হয়, এক সেই চিন্তাই সত্য। লোকের সহিত প্রয়োজন ছাড়া কোন অতিরিক্ত কথা বলা না। কথা শোনা বা শোনান — দুই ভাবকেই সংযমিত করা আবশ্যক। যেই আলাপে ভগবৎ ভাবের পরিসর বৃদ্ধি পায়, তাহাতে বিশেষ বাধা নাই। অথবা সে সম্বন্ধে আপন কোন সংশয় দূর হইতে পারে — এমন আলোচনা বিধেয়। তবে ইহা জানিবে যে তাঁহার ধ্যান ধ্যারণা যতই করিবে ততই তোমার বিচার ও বিবেক শক্তি উদ্বোধিত হইয়া কোনটি ভাল, কি তোমার প্রয়োজন — এ সমুদয় দেখাইয়া তোমার শুদ্ধ চিন্তার সহায়তা করিবে। আর দেখিবে জাগতিক বাধা — রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ বা শব্দে তোমার আকর্ষণ কমিয়া আসিতেছে এবং ক্রমে একমাত্র ভগবৎ চিন্তায় ডুবিয়া থাকিতে ভাল লাগিতেছে। শুদ্ধ চিন্তায় থাকিলে তার প্রধান লক্ষণ এই যে কাহারো কিংবা কোন বস্তুর উপর বিরুদ্ধ ভাব কদাচ আসিবে না। ক্রমে ক্রমে দিন দিন সত্য, ত্যাগ, সংযম-প্রেম, ক্ষমা, ধৈর্য, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণ বাড়িতে থাকিবে। আরো দেখিবে যতই ভগবৎকৃপা লাভ হইবে, ততই আলাপাদি ও নানা ভাবের উপর দৃষ্টি — বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ইত্যাদি কমিয়া যাইবে এবং আমারই ইষ্টের বিভিন্ন পূজা বলিয়া বোধে আসিবে। যেমন যিনি আমার পিতা, তিনি কাহারও বন্ধু, কাহারও মামা। ব্যবহারেও কেহ বাবা ডাকে, কেহ মামা ডাকে, কেহ কাকা ডাকে — সেইরূপই মনে হইবে।

পূজা, প্রার্থনায়, ধ্যান, জপ, কীর্তন, যজ্ঞাদি দ্বারা দিবারাত্রির সদ্ব্যবহার করা চাই। প্রথম অবস্থায় ধর্ম-কর্মে মনোনিবেশ করিলেও

যেখানে জাগতিক ভাবের কর্ম থাকে, সেখানে আধ্যাত্মিকের সহায়ক জাগতিক কর্ম না করিলে, এক সময়ে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিলে বিশেষ ফলোদয় হয় না। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য বহির্জগৎকে ভুলিয়া গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া নির্জনে একান্তে অন্তরে অন্তরে তাঁহার অখণ্ড স্মরণে অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। সেই সময় কেবল ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন অন্য দিকে যাহাতে মন না যাইতে পারে, তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা। ভগবৎ কার্যাদিতে যদি বিন্দুমাত্রও কোনরূপ বিঘ্ন বা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার উপর উপাসকের প্রথম অশ্রদ্ধা অরুচি আসা দরকার। যদি এইরূপ না আসে, তাহা হইলে বুঝিবে তাহার সে বিষয়ে বিশেষ আসক্তি রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপে ক্রমশঃ সাধকের ফল খণ্ড খণ্ড ভাবের ভিতরে বাহিরে এক অখণ্ড অনন্ত সত্তার প্রকাশ হইয়া ক্রমোন্নতিতে ভাব ও কর্মাদির পূর্ণ সমাধানের আশা। পূর্ণ সমাধানেই তাহাকে বিশ্বভাবে 'ডুবানো মাণিক' বানাইয়া দেয়। এইরূপ না হওয়া পর্যন্ত যার যার উপাসনার প্রথম অবলম্বনটির মূলোচ্ছেদ হয় না। তাই দেখিবে বিচারে ও যুক্তিতে এক অবিচ্ছিন্ন সত্তার মীমাংসায় পৌঁছিয়াও পূর্ণ সমাধানের অভাবে, সাধনার যে ধারাটি আরম্ভে অবলম্বন করিয়া চলিয়া থাকে, উহার প্রতিই বিশেষ লক্ষ্য পড়িয়া থাকিতে পারে। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন নিবন্ধ ভাবের গণ্ডীতেও সাধক বদ্ধ হইতে পারে। যাহাতে গণ্ডীবদ্ধভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, উহা কিন্তু দ্বন্দ্ব রহিতের দিক — দ্বন্দ্বাতীত নয়।

বুদ্ধি মোটামুটি তিন রকম। প্রথম জীব-বুদ্ধি, ইহাতে ধর্ম সংশ্লিষ্ট থাকিলেও জীব সাধারণ ভাবে ইহার ব্যবহার করে। দ্বিতীয় ধর্ম-বুদ্ধি, ইহাতে ধর্ম-নিষ্ঠা প্রবল থাকে। সকল কর্মে ধর্মকে প্রধান লক্ষ্য করিয়া চলে। তৃতীয় প্রজ্ঞা বা যোগজ-বুদ্ধি। উপরোক্ত ধারায় চলিতে চলিতে ইহার উদয় হয়। যখন উপাসনার দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তখন প্রাতঃকালীন সূর্যোদয়ের মত, তাহার হৃদয়ে এক বিশুদ্ধ জ্ঞান দেখা দেয়, যাহাতে সে পরমার্থ তত্ত্বের খাঁটি সন্ধান পায়। স্বভাবতঃ তখন একটি নির্মল বুদ্ধি, যাহার নাম যোগজ-বুদ্ধি বলিতে পার, সে প্রাপ্ত হয়। সেই বুদ্ধি কেবল নিত্য ও সত্য ধরিয়াই খেলা করে। সেই খেলায় এ জাতীয় ইচ্ছা অনিচ্ছার

প্রকাশ থাকে না। প্রথমতঃ সাধারণ মানুষ যখন সাধনায় নামিবে, সেই সাধকের প্রধান লক্ষ্য রাখা ব্রহ্মচর্যের দিকে। ব্রহ্মচর্য না হইলে কিছুই হইবে না। জীব মাত্রেরই ত সাধনার ভিত্তি — সত্য পালন ও ব্রহ্মচর্য।

খেলার সাথী সুরবালা

সুরবালা বয়সে এ শরীরের প্রায় ১০ বছরের ছোট ছিল। যখন পর পর তিনটি ভাই মারা যায়, তখন মা'র কান্নাকাটি দেখিয়া এ শরীরের খেয়াল হইয়াছিল যে এখন যদি একটি বোনও হয় তবে মা'র কিছুটা সান্ত্বনা হয়। কিছুদিন পরেই সুরবালা আসিল। হৃষ্টপুষ্ট, রং খুবই ফর্সা। চোখ মুখের গঠন দেবীর মতন। যে দেখিত সে তাহার সৌন্দর্য ও সৎ ভাবে আকৃষ্ট হইত। এ শরীরের শৈশবের কিছু সময়ের খেলার সাথী ছিল সুরবালা। তাহার মুখে সর্বদা হাসি লাগিয়া থাকিত। যখন কোন কারণে কাঁদিত, তখন শ্বাস ফেলিতে পারিত না। মুখ কাল ও স্থির হইয়া যাইত। ভয় হইত শ্বাস না বন্ধ হইয়া যায়। এ কারণে সকলে তাহাকে আনন্দে রাখিতে চেষ্টা করিত। তাহার অশৌচ ঘর হইতেই এ শরীর সর্বদা তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া রাখিত। তাহারও এ শরীরের প্রতি আকর্ষণের ভাব দেখা যাইত। চলাফেরায়, ডাকা খোঁজায় তাহার কেমন একটি অস্বাভাবিক ভাব প্রকাশ পাইত কিন্তু ইহা কেবল এ শরীরের সঙ্গেই হইত। তাহার যত প্রাণের কথা এ শরীরকে জানাইয়া সে সুখী হইত। ইহার সহিত সে সমান বয়সীর মত ব্যবহার করিত। এ শরীরকে ছাড়া সে থাকিতেই পারিত না। এ শরীরের বিবাহ হইবার পর শুনিয়াছি সে অনেকদিন রাস্তার উপর একা একা বসিয়া 'বোনদি' 'বোনদি' বলিয়া ডাকিত ও কাঁদিত। তাহার বিবাহে এ শরীর উপস্থিত ছিল। তখন কি জানি কেন মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল — তুমি আর বেশী দিন থাকিও না। তাহাই হইয়াছিল। শুনিয়াছি সে রোগ শয্যায় শুইয়া সর্বদা এ শরীরের কথা চিন্তা করিত এবং বোনদিকে স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল।

তাহার আয়ুর পূর্ণ সংখ্যা ১৮ বৎসর ছিল। ১৮ বৎসর ৮ মাসে সে মারা যায়। বাকী ৮ মাস এ শরীরকে দেখিবার জন্যই বাঁচিয়া-

সাধকের শ্রেণী বিভাগ

সাধকের একটা অবস্থা আসে যে, সে-সময় যে যেই ভাবে তাঁহার শরণাগত হয় সে সেই ভাবে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। যাহাদের রোগ পীড়া সম্বন্ধীয় শারীরিক স্বার্থ অধিক, তাহা তাহার নিজের শরীরের বা অপরের উপর নিয়া কৃপাদান করে। যাহার বিষয়ের স্বার্থ, তাহা যে কোন ভাবের ভিতর দিয়াও পূর্ণ করিতে পারে। আবার যাহার আধ্যাত্মিক ভাব, তাহাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়াও উন্নত করে। সে সব কি প্রকার? যখন সাধকের সম্পূর্ণ-রূপে খেয়াল হয় যে নিজেতেই সব, সবেতেই সে-ই। আবার যাহা দেখা যায় তাহা তাহারই নিজের শরীর — মানুষ, পশু, গাছপালা ইত্যাদি সবই এক আমিই — সে-ই। এইরূপও আসে কিন্তু। কোনও স্থলে কাহারও ভোগটা সে নিজেতেও নিয়া নেয়। আবার যদি সে রক্ষা পাইবার থাকে, তবে ঐ রূপও হয়। যেমন — একবার এই শরীরটা একদিন সিদ্ধেশ্বরীতে আসনে বসিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে, ইহার ভিতর হঠাৎ উঠিয়া সিদ্ধেশ্বরীর নিকটস্থ পুকুরে শরীরটা আগে আগে যাইয়া দেখে একটি শিশু জলে পড়িয়া গভীর জলে চলিয়া যাইতেছে। তখন নামিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। যাহার ছেলে তাহাকে খুঁজিয়া দিল। তাহারা কালী মন্দিরে বসিয়াছিল। আবার এমনও স্থান আছে, কোনও রকম ভোগ না করাইয়া বা নিজে না নিয়াও তাহাকে রক্ষা করা যায়। কোনও উচ্চ সাধক সাধন বল দ্বারা অপরকে আত্মশক্তি দান করিয়া আধ্যাত্মিক রাস্তায় খানিকটা অগ্রসর করাইয়া দিতে পারে। সে সময় তাহার অনেক রকম শক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু সাধক যদি তখন গর্বিত হইয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়া চলিতে থাকে, তবে সে সেইখানেই বদ্ধ থাকে। কারণ তখনও ত তাহার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বাকি রহিয়াছে। তাহা হইলে সে নিজে শেষ লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিল না। যদিও নানা প্রকার অলৌকিক বিভূতি লাভ করে, কিন্তু সে ইচ্ছা অনিচ্ছার হাত হইতে একেবারে মুক্তি পায় নাই বলিয়া তাহার অনধিকারের পরিচয়ও সময়ে হইয়াই থাকে। ইহা একটি অবস্থা। স্বয়ং আচার্য, জগৎগুরুর পক্ষে কিন্তু এ কথা নয়।

আর একটা দিকের কথা হইল — হওয়া। (মা হাসিতে হাসিতে বলিতেছিলেন) যাহার জপ ধ্যান রূপ, গুণ, পূজা, পাঠ, কীর্তন, সৎসঙ্গ প্রভৃতির দিকে বিশেষ আকর্ষণ লইয়া যার যার ইষ্ট চিন্তায় মুগ্ধ থাকে, ধর না, তাহারা হইল তোদের — ম্যাট্রিক। যাহার যে বিষয়, উপাসনা সাধনার দিকে, তাই নিয়া কিন্তু।

যাহারা ক্রমে পূজা পাঠ, ধ্যান ধারণা ইহাদের ভিতরেও কেবল ইষ্ট ধ্যানের চেষ্টা, দেবতা ও ভগবৎ তত্ত্বাদির আলোচনা করে এবং ভিতর হইতেও বিচার স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হয় — যে লাইনে যাহার গতি বৃদ্ধি, পর পর যে বিষয়, সে প্রকাশের জন্য যে বিশেষ ধ্যানশীল, তাহারাই হইল তোদের — আই-এ।

আবার যাহারা ক্রমশঃ ভগবৎ নানা তত্ত্বাদি, ভাব ও নিজ নিজ ইষ্ট তত্ত্বের ভাবে ভাবিত, কি আত্মা-তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান প্রিয় এবং অনুভব ও বিচার তৎপর হয় — যাহার যাহা প্রবল — সেই সেই তত্ত্ব বিষয়ে। তাহারা হইল তোদের — বি-এ।

আরও অগ্রসরে যাইয়া প্রাকৃত জগতের টানাটানি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া মহাসত্ত্বা অপ্রাকৃত গুণাতীত, আত্মজ্যোতি ও স্থিতি — সেই যে মহান এক স্থিতি, তাহারাই তোদের এম, এ। ইহাদের ভিতরে সম্প্রদায় নিবদ্ধ যে দিক, তাহার কোনটারই ছোট বড় কোন ক্রমের প্রশ্ন নাই। আপন আপন গতি অনুযায়ী তাহার সেই সেই প্রকাশ। শুধু বুঝাইবার জন্য ত এই জাতীয় বলা। প্রাধান্য কিন্তু আপনাপন — যেখানে বিরোধ নাই — সেই ত চাওয়া, পাওয়া। বলবে দ্বন্দ্বাতীত আর থাকবে দ্বন্দ্ব? যিনি সকল তত্ত্বের মর্ম অবগত হইয়া সর্ব জ্ঞান অজ্ঞানের পরপারে স্থিত সেইখানে কেমন সুন্দর — যিনি গলিয়া নিরাকার, তিনিই জমিয়া সাকার। আবার যিনি জমিয়া সাকার, তিনিই গলিয়া নিরাকার। জমাজমি গলাগলি তাহাতেই আকারে, প্রকারে, নিরাকারে — সেই স্বয়ংই।

আকারে পুতুল, বাড়ীঘর, নানারূপ, আর আকার শূন্য, দুইটার মধ্যে এক-ই দুই, দুই-ই এক। আকারে প্রকারে প্রকাশটি ঐ। কেহ কিন্তু, সেই যে গলিয়া গেল তাহাতে স্থিত; কেহ আবার আকার প্রকার রূপে বা সেই প্রকাশে স্থিত। যেখানে এই যে গলিয়া গেল, কি আকার, প্রকারে — এই দুইয়ের যে পূর্ণাঙ্গীন সমাধান, সেখানে প্রশ্ন উত্তর কি? আবার একটা কথা — প্রেমে গলিয়া যায়,

ছিল। তাহাকে যাইয়া দেখিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই সে মারা যায়। ঢাকাতে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী বসিয়া যে সময় এ শরীরের মুখ হইতে বাহির হয় — সে মুক্ত হউক, সেই সময় সে জয়দেবপুরে প্রাণ ত্যাগ করে।

এ শরীরের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শরীরের ব্যারাম দেখা গিয়াছিল। এ শরীরের এই কতদিন খেলার সাথীর জন্য তাই দেখা যায়, সে জগতে আসিয়াছিল এবং উপস্থিত তাহার সঙ্গে ঐ পর্যন্ত খেলা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ভিতর তাহার মুক্তির ভাব জাগিয়াছিল। তাহার মৃত্যুর প্রায় ৬।৭ বছর পর যখন একবার চুনার গিয়াছিলাম তখন ঠিক সুরবালার মত রূপ ও গঠন একটি মেয়ে জ্যোতিষের বাসায় অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ দেখিয়াছিলাম।

যদিও এ শরীরের পিতা ও মাতার লৌকিক হিসাবে সন্ধ্যা পূজা পাঠ ইত্যাদিতে বিশেষ কোন ঘটা ছিল না কিন্তু উভয়ের ভিতর ভগবানে অনুরাগ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস সর্বদা দেখিতাম। পূজা সন্ধ্যা যখন যা করিতেন, মনপ্রাণ দিয়াই করিতেন। বিশেষতঃ মা'র ভগবানের উপর এত অটল বিশ্বাস ছিল যে অজস্র দুঃখ দৈন্য, শোক তাপের ভিতরও, সর্বদা তাঁহার দান, যখন যেভাবে যাহা আসিত, সকলই আনন্দে গ্রহণ করিতেন। বাবারও নাম গানে কীর্তনাদিতে মত্ততা ছিল।

মূর্তিদর্শন ও তত্ত্ব

আর একদিনের জিজ্ঞাসার উত্তরে মা বলিলেন — যখন মূর্তি দর্শন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাব ভক্তিতে উপাসকের হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায়, তখন তাহার উপাস্য মূর্তি, সকল দেবদেবীর উপর প্রকাশ পায়। তাহার বোধ হয় যে আলাদা আলাদা যত মূর্তি আছে, প্রত্যেকেই যেন তাহার বাঞ্ছিত মূর্তি, নানা বেশ ও নানা ভাব নিয়া দাঁড়াইয়া আছে। যেমন কাহারো মাতাকে কেহ মাসী, পিসী, দিদি ইত্যাদি নাম, রূপ ও ভাবে দেখে ও বলে কিন্তু সে একই। পূজা অর্চনাদির দ্বারা যখন উপাসকের উপরোক্ত জ্ঞান গভীর হইতে থাকে তখন প্রথমতঃ মনুষ্যাদির উপর তাহার উপাস্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে আছেন, এই বোধ

আসে। পরে আবার পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গাদিতেও এই ভাব দেখে। ক্রমে উদ্ভিদাদিতেও তদ্রূপ মনে হয়। ধীরে ধীরে জল অগ্নি মাটিতে সে ভাব আসিয়া বায়ু ব্যোম ইত্যাদিতে যাইয়া পড়ে। তখন বিচারে আসে, জগতে যা কিছু দেখি সকলই আমার এক উপাস্যেরই রূপ। সময়ে নিজেও বাদ যায় না। এইরূপে তাহার সেই ভাবটি গাঢ় হইলে একটি ভাব জাগ্রত হয় যে, যখন যে দিকে লক্ষ্য পড়ে, তখন তাহার উপাস্যের মূর্তি আসিয়া তাহাকে সাময়িক বিভোর করিয়া রাখে। সে তন্ময়তা যতই স্থির হয়, ততই তাহার নিজ উপাস্য, সর্বভাবে, সর্বরূপে, সর্বত্র আছেন দেখিয়া ও চিন্তা করিতে যাইয়া, কখনও কখনও মূর্ত ভাবটি অদৃশ্য হইয়া কি এক ভাবে তাহাকে বিভোর করিয়া রাখে। এ অবস্থা আসলে চিত্তশুদ্ধি। এইরূপে খণ্ড খণ্ড মূর্তি সংস্কার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেলে স্বীয় ইষ্ট মূর্তিরই অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্তভাব ব্যষ্টিভাবে সর্ব দৃশ্যে অনুভূত হয়। তখনও সাধক বাহিরের দৃশ্যাদি নিয়া জড়িত থাকে বলিয়া তাহার শরীরটা সাময়িক অবশ ও উন্মাদের মত দেখাইতেও পারে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সর্বক্ষণ একটা অনন্ত অখণ্ড ভাবের আবেশ থাকিতে পারে। ইহা ভাব সমাধানের একটা অবস্থা মাত্র।

যেমন কেহ একটি রূপ নিয়া সাধনা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বিকাশের সাথে সাথে সর্বরূপ, সর্বগুণ, সর্বভাব সেই যে মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ, সব আমারই ইষ্ট মূর্তির। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু, সর্বরূপে ঐ-ই। ক্রমশঃ ঐ মহানভাবে স্থিত হইতে হইতে কাহারও কাহারও ইহাও হইতে পারে এক আত্মাতেও যাইয়া স্থিতি লাভ করে, কোন মূর্তির স্থানই নাই। কেহ রূপেও থাকিতে পারে, আবার ইহাও হইতে পারে যে, সে কোন রূপই নিল না। আত্মস্বরূপের ধ্যান গুরুর আদেশানুযায়ী, সেই যে এক আত্মা। ধ্যান যোগে যদি কাহারও স্থিতি ঘটে তাহা হইলেও প্রকাশ পাইতে পারে যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহুত্ব, প্রাকৃত, অপ্রাকৃত — সে কে? কি? ঐ যে — নির্দ্বন্দ হইয়া — আত্মারাম। কোন ভাবেই শুধু অবশ হইলেই হইল না, শুধু ডুবিলেই হইল না, স্থিতি হওয়া চাই। বলবে দ্বন্দ্বাতীত আর যদি থাকে কাহারও সঙ্গে দ্বন্দ্ব — ইহা কি করিয়া হয়?

জ্ঞানাগ্নিতে জ্বলিয়া যায়। যেখানে গলিয়া যায় সেইখানে যা তাই। আর জ্ঞানাগ্নিতে যাহা জ্বালাইয়া দেয়, যাহা জ্বলিবার জ্বলিলে যা তাই। দৃষ্টি ভেদের স্থানেই মাত্র এইপ্রকার — স্বরূপ প্রকাশ আর কি।

একটা চমৎকার এই, যাহারা বেদান্ত বিচার দৃষ্টিতে দেখিবে অর্থাৎ যতক্ষণ বিচার, বিচার করণেওয়ালা আর যাহার বিচার করে, ততক্ষণ লেশ ও প্রারব্ধের কথা আসিবেই। গলা আর আকারের কথাটাও সেই বিচারেই দেখিবে। লেশ ও প্রারব্ধ ইত্যাদি আসিবে না, কখন? যখন তিনটির প্রশ্ন নাই। কি যে থাকে আর কি যে থাকে না সেইজন্যে ভাষায় স্থান কোথায়? ভাষা ভাসে কিছুর উপরে কিনা, সেখানে কিছু কোথায়?

আবার মহাশক্তি, সত্ত্বা যাহার পরে আর নাই। যাই বল, আত্মস্বরূপে স্থিতিই বল, রামসীতা, শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ কোন তত্ত্বেরই প্রকাশের অভাব যেখানে হইতে পারে না — ঐ ঐ ঐ-ই। সে স্থিতিতে স্বাধীন ভাবে খেলা ইত্যাদি যা বল — তোদের পি, এইচ্, ডি, কি বলিস্ না! কোথায় এখন খুঁজিয়া নে।

হরিনামে মা

কোন প্রশ্নের উত্তরে মা বলিতেছেন — এ ছোট্ট মেয়েটার হরি-নামের কথা বলছ — তোমরা নাম রূপের মধ্যে আছ ত। এ শরীরটিকে নিয়া যখন যে ভাবে থাক সেখানে দেখতে পাচ্ছ না, তৎ ভাবেই তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেছে — তোমরা যা জিজ্ঞাসা করিলে। হ্যাঁ, অনেক সময় এই স্বাভাবিকের মধ্যেও অস্বাভাবিক পাইতেছ যে বলিতেছ — এখানে ত যখন যেমন হইয়া যায়। যাহা হইয়া যাওয়াটাও স্বভাবতঃ হইয়া যাওয়ার; করণে-ওয়ালাটাও ত আলাদা আর কেহ নয়। নাম শোনা এবং নাম করা ওখানেও যখন যেমন প্রকাশ, এ শরীরটার পাইয়াছ ও পাইতেছ ত।

যেখানে নাম-ব্রহ্ম, সেই স্বয়ং — রূপে-অরূপে নিত্য আছে। নাম রস, আকর্ষণ কৃষ্ণ, আনন্দরাম, আত্মারাম এও ত তোমরা বলে থাক। এখন বিগ্রহরূপে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম যা বল — জল বরফ যেমন, আকার নিরাকার ধর না। আচ্ছা, তোমরা বলিতে পার, যে নামে যাহাকে ডাকা শিব দুর্গা ইত্যাদিও — যে কোন নামই বল

না কেন, সেই যে মহাবিষ্ণু পরম শিব পরব্রহ্ম — মূর্ত-অমূর্তে সেই যে, আবার শক্তি সত্ত্বারূপে, সেই স্বয়ংই; আকার, নিরাকারে, প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ — সেই আত্মাই ত। ইহার ভিতরে যে কোন নামে এবং রূপের ভিতরে চলিলে, সেই নাম ব্রহ্মেরই উপাসনা হয় না কি? হ্যাঁ, বলিতে পার যে নামে যাহাকে ডাকা, সেইরূপে সেই ভাব প্রকাশ ইহা ত স্বাভাবিক কথাই কিন্তু ইহাই চরম পরম কথা কিনা বল?

যেখানে পিতা, পুত্র, পতি কেহই কম নয়, দেখিতেছ না, একেতে সেই। হ্যাঁ, এক এক ধারা নিয়া এক এক সম্প্রদায়ও। স্বরূপ প্রকাশ চাই ত — সর্বনাম, সর্বরূপ কোথায়? যেখানে বিরোধের প্রশ্ন নাই। বিচার কর। আবার ধর — যেখানে অখণ্ড ধারায় বিচার তৎপর হইয়া, কি সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, শাশ্বত তোমরা যা বল, স্বয়ং প্রকাশ যা আছে — সেই প্রকাশেরই চেষ্টা। যেখানে 'ন-ইতি' — এও তিনি নন, এই যে লক্ষ্য সেই তত্ত্বে, সেই চরম পরম নিত্য, স্বয়ং প্রকাশ যাহা আছে, সেই প্রকাশের চেষ্টা। আবার এটা ওটা যাহা কিছু, ঐ-ঐ সেই সত্য। এই যে দিকের চেষ্টা, এখন দেখ, লক্ষ্য সেই প্রকাশেরই। যোগে যাগে যে দিক ধরিয়াই হউক সেই মহাযোগেই যাহা নিত্য আছে। এখন ধর, তুমি নাম রূপের মধ্যে যে দাঁড়াইয়া আছ বা কোন মতে পথে আসিয়া — সেই স্বরূপ প্রকাশের চেষ্টা করা ত।

সেইদিন জিজ্ঞাসা করিলে না — হরিনামে তোমার এই ভাব হয় কেন? আরে! তোমাদের সংস্কার অনুসার গুরু যে লাইন তোমাদের দেন, তোমরা বিভিন্ন পথ দিয়া, সেই পথেরই যাত্রী ত, সেই ভাবের প্রকাশ। অর্থাৎ নাম রূপ না মানিয়া তাহা হইতে পারে না। নাম রূপ মানিয়াই তাহা আবার কোন দিক ধরিয়া বাদ দেওয়া। এখন তোমাদের প্রশ্ন হইল যে — যেখানে এই শরীরটা যখন যে ভাবের ভিতর, সেখানে সেই ভাব নিয়াই কিন্তু। আবার খেয়ালে যখন যেটা সেই ভাব নিয়াও। এখন তোমরা ভাব। যেটা নিয়াই হইত, তোমাদের প্রশ্ন — মুক্ত কোথায়? প্রশ্নোত্তরে যাহাদের স্থিতি তাহাদের ত এই কথা থাকিবেই। হরি যে নামে সব হরে, শব হরে, যা হরে তাই ত হরে, সেই যে হরি। হ্যাঁ! সর্বনাম তাঁহার নাম, সর্বগুণ তাঁহার গুণ, সর্বরূপ তাঁহারই রূপ, আবার নাম, রূপ, গুণের প্রশ্নই নাই। সবেতে যে সব সেই দিকে দৃষ্টি না থাকায় প্রশ্ন আসা

স্বাভাবিক, তুমি যে দিকটা বলিতেছ। তোমরা নাম রূপের অতীত হইবার জন্য এক এক ধারা নিতেছ ত, নাম রূপ মেনেই যে। সেখানে নাম রূপের মধ্যে যে সেই স্বয়ংই, কাজেই যে যে নামের যে যে ভাব, যে যে মন্ত্রের সেই সেই ধারা প্রকাশ। সেই প্রকাশ হওয়া ত স্বাভাবিক। কাজেই গুণ প্রকাশ করিবে ত — সগুণই বল, নির্গুণই বল, গুণাগুণের অতীতই বল।

যেমন সন্ন্যাস নেওয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য, তেমন কীর্তন শোনা কীর্তনময় প্রকাশিত হইবার জন্য। তোরা যে কীর্তন করিতেও পারিস্ না, শুনিতেও পারিস্ না। কেননা, তোরা সে সময়েও বাহিরের নানাভাবে এমন রূপে ধরা থাকিস্ যে কীর্তনের আনন্দ তোদের ভিতর বিশেষভাবে পৌঁছিতে পারে না। এ কারণে কীর্তনের আগেও যেমনটা ছিলি পরেও প্রায় তেমনই থাকিস্। মাঝখানের আনন্দ তোদের বিশেষভাবে পরিবর্তন যেন আনিতে পারে না। তবে নামের ফলস্বরূপ যতটুকু ততটুকু ত নিশ্চয় আছেই, দিবেই। এই সূত্র ধরিয়া ত জগতের চলা।

নাম নামী ত অভেদ, নামও তাঁহার এক রূপ ত, স্বয়ং ফল। এক টুকরা আগুন যতটা জ্বালাইতে পারে, ততটা জিনিষ তোরা একসঙ্গে জড় করিতে পারিস্ না — সেইরূপ নামের গুণ জানিস্। যেমন তোরা বলিস্ না — একবার হরি নামে যত পাপ হরে, জীবের কি সাধ্য আছে তত পাপ করে। ইহা তো সত্য কথা।

যেইরূপ মাটিতে বীজ পুঁতিলে চারা না হওয়া পর্যন্ত স্থানের দিকে লক্ষ রাখিতে হয়। চারা হইলে বেড়া ঘেরা দিতে হয়, তদ্রূপ যখন ঈশ্বরভাব একটু আসে তখন খুব যত্নের সহিত বিশেষ নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া তাহার বৃদ্ধির জন্য দুনিয়ায় থাকা দরকার।

কীর্তনের সপ্তভূমি

কীর্তনের ভাবের কথা এবং সেই সম্বন্ধে লক্ষণের কথা শুনিতে চাস্ যখন তবে শোন। ১। প্রথমতঃ যে রূপটি, ভাবটি উপলক্ষ্য করিয়া কীর্তন শুনিয়া বা করিয়া তাহা ধারণা করিতে করিতে সাধারণ আনন্দের সহিত মাতামাতি করিয়া — ক্ষণিক মিশ্রিত একাগ্রতার দরুণ, তাহার এ জগতের ইচ্ছাই খেলিতেছে কিনা — এ জাগতিক

ইচ্ছাটা বেশ প্রকাশ হয়। তাহাতে শরীর অবশ দেখা গেলেও ভিতরে বেশ জাগতিক ভাবের হুঁসও থাকিতে পারে। ইহা শরীরের একটা জড় অবস্থা মাত্র। কাহারও অজ্ঞান হইয়া পড়িবার মত হইতে পারে, কারণ বিষয়-বাসনা শূন্য ভাব ত আর নয়।

২। বার বার প্রবল ইচ্ছা দ্বারা যাহার ভাব আরও বৃদ্ধি পায় তাহাতে যে নাম, রূপ ও ভাব নিয়া সে কীর্তন আরম্ভ করে বা শোনে সে ইষ্টের প্রতি ঐকান্তিকতায় তাহার সাময়িক বেশ আনন্দ খেলে এবং মনটিও যেন আবেশের মত হয়। ইহা সাময়িক শরীর ও মনের যুগপৎ জড় অবস্থা।

৩। ক্রমশঃ ভাবের আতিশয্যে যাহার কীর্তনীয় রূপেতে যতটুকু তন্ময়তা আসিয়া পড়ে চিত্তশুদ্ধি হইতেছে বলিয়া ততটুকুর জন্য তাহাকে সাময়িক বালকবৎ ইত্যাদি দেখাইতে পারে। কখনও হাসে কখনও কাঁদে কখনও বা ধ্যেয় মূর্তির মত সামান্য অঙ্গভঙ্গি আদি করে। আবার কখনও সকল মূর্তিতেও আকর্ষণ দেখা যায়। কখনও অস্থির ভাবে গড়াগড়ি দেয় আবার কখনও জড়বৎ পড়িয়া থাকে। এই সব ভাব অস্থায়ী বলিয়া ইহা ভগবৎ ভাবের অবস্থার আভাস মাত্র।

৪। উক্তরূপ তন্ময়তা যখন ক্রমে ক্রমে স্থায়ী হইতে আরম্ভ করে তখন সে যেদিকে তাকায় কেবল তাহার এক উপাস্যের স্ফুরণ হয়। কীর্তনাদিতে তাহার সাময়িক অস্থিরতা দেখা গেলেও দিবারাত্রি তাহাকে উপাস্যের লক্ষ্যে স্থিরভাবে বিভোর থাকিতে দেখা যাইতে পারে এবং সর্বদা অন্তর্জগতের লক্ষ্যের দিকে অবস্থিত বলিয়া তাহার মুখ দিয়া একটু উচ্চভাবের কথা বাহির হয় এবং তাহার সামান্য কিছু অলৌকিকতাও প্রকাশ পাইতে পারে। ইহার নাম ভগবৎ ভাবের আর একটি দিকের স্ফুরণ।

৫। পর পর যখন তাহার সে ভাব জল জমাট হইয়া বরফের মত গাঢ় হইতে আরম্ভ হয় (এই জমাট কিন্তু নিরাকারের জল বরফ হওয়ার জমাট নয়) তখন আর তাহার কেবল এই ভাবের রূপটিই থাকে না। মূর্তিসত্তার ও একভাবের কি যেন এক খেলায় মহা আনন্দে তাহার দিন রাত্রি কাটিয়া যায়। সেখানে জাতি সম্প্রদায়ের বাঁধন যেন ছুটিয়া যায়। একতার দিক হইতেছে বলিয়া (মন মানি জাত মানি না, একথা এখানে দাঁড়ায় না কিন্তু মনে রাখিও) এ

অবস্থায় তাহাকে কোন কোন সময় জড়বৎ বা অস্থির দেখা গেলেও তাহার ভাবগুলি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত স্বাভাবিক হইয়া পড়িতে থাকে। নিজস্ব আলাদা বলিয়া তাহার কিছুই যেন দেখা যায় না। ইহা আবার এক রকম।

৬। ক্রমে যখন সবকিছু তাহাতে অর্পিত হইতে হইতে যুগপৎ রূপে অরূপে এক মহান ভাবে ডুবিতে থাকে, ইহাও এক প্রকাশ।

৭। পরে সে এ ভাবেরও পরপারে যাইয়া ব্যক্ত অব্যক্ত ভাব ও রূপে স্থিতি লাভ করিতে পারে। ইহাকে মহান ভাব বলে।

সর্বরূপে অরূপে স্বরূপেরই প্রকাশ

রামসীতা বা রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা কি? সেই পরম পুরুষই বা কে? পুরে শয়ন—স্বয়ং; স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের প্রশ্নও যে জায়গায় আসে না — সে কি? কে? সেই রসময়ই বা কে? তাঁহার প্রকাশ কোথায়? তাঁহার ভিতরে এইসব প্রকাশ স্বাভাবিক। ইহার ভিতরে আরও কত রকম — মহাপ্রকাশে।

মা হাসেন আর বলেন — ধর না চিন্ময়টা কি? চিনিরই পুতুল, চিনিরই ঘর, চিনিরই বাড়ী। চিনি আসা, চিনি যাওয়া। চিনিই গড়ন, চিনিই ধরণ — যেমন চিনির মঠ মন্দির তোরা খাস না? আকার, আবার রস — রসরাজ সেই আর কি। আকার আকৃতি থাকিয়াও অনাকৃতি। ক্রিয়া থাকিয়াও অক্রিয়া। কাহার সঙ্গে সেখানে? সেই জন্যই বর্ণনা কি? সাকার — স্ব-আকার। অর্থাৎ স্ব-ই স্বয়ংই। চিন্ময় রাজ্য অ-প্রাকৃত — যেখানে পর পরের প্রশ্ন নাই, কেবল চৈতন্যই। অচৈতন্যের স্থান নাই। যে আলোর দ্বারা চন্দ্র সূর্য সমগ্র বিশ্বের যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় — সেই যে মহাজ্যোতি, মহাপ্রকাশ না হইলে এই জ্যোতি কি? অপ্রাকৃত কি? তাহার প্রকাশ হয় না। যেখানে আলো অন্ধকারের প্রশ্ন নাই, সেই যে আলো — উহা কালের অধীন, প্রকৃতির অধীন থাকিয়া হয় না। সাময়িক আভাস প্রকাশ হইতে পারে — মহাপ্রকাশে এই প্রকাশ।

এ সমগ্র ভাবগুলিই যাহা একটু শুনলি, উপাস্য উপাসকের নাম রূপ, দাস প্রভু ভাব নিয়া আরম্ভ ত! চরম অবস্থা না পেঁছানো

পর্যন্ত সে বিশেষ ভাব নিয়া চলিতে থাকে। নিত্যদাস প্রভু ভাবটা কি? কে?— তাহার সমাধান। গুরু ভাবেরও একটা সুন্দর প্রকাশে স্থিত। প্রভুদাস পূর্ণাঙ্গীন স্থিত প্রকাশ।

আবার মা বলিতেছেন — মহাভাব, বিরহ মিলন নিত্য নূতন নূতন ভাবের প্রকাশ। সেইটা কি? সে একটা রকম — ভাষা কই? এখানে কিন্তু বিশেষ স্থলে অঙ্গ ভঙ্গিতেও তৎস্বরূপ হইয়া সেই সেই রূপের প্রকাশ করিতে পারে, আলাদা নাই বলিয়া। এই অঙ্গভঙ্গি — মন-রাজ্যের ব্যাপার নয়। আবার আলাদা হইয়াও এক, এক হইয়াও আলাদা। সর্বরূপ, সর্বভাব, সর্বগুণ — রূপে অরূপে, গুণে নির্গুণে, ভাবে অভাবে — ঐ তিনিই যুগপৎ — স্বয়ংপ্রকাশ। সেখানে বিগ্রহাদি কি, কে? রাধাকৃষ্ণই বল, সীতা-রামই বল, শিবদুর্গা, কালীই বল, সিদ্ধিদাতা গণেশই বল ইত্যাদির মধ্যে যে যেরূপের উপাসক, সেই সেই ধারায় প্রকাশ স্বাভাবিক। বিগ্রহাদি পূজা যেখানে, আবার পূজার যেখানে প্রশ্ন নাই — ভাবিয়া দেখ, বুঝ, স্থান বাহির কর। এ দিকের কথা যাহা, এ যে একটু মাত্র বলা।

প্রশ্ন — এই যে হরিনামে ভাবাবেশ, এও ত ভাবেরই অধীন, ভাবেরই একটা উন্মাদনা? মা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন — ভাব কি? কার ভাব? কে অধীন? কার অধীন? ভেবে দেখেছ কি? হ্যাঁ, ভেবে পাওয়ার ত এ নয়। তোমাদের বিচার বুদ্ধিতে এইসব আসা স্বাভাবিক। আরে বাবা! ভাবের ভাবুক না হইলে এইসব ধরা কঠিন, — এ যে ভাবাতীত ভাব। ঐ মহাভাব — ধরিবে কিসে? অভাবের ভাবে, এইভাব ধরিবার রাস্তা নয় — এ যে স্বভাব — স্বয়ংই ভাব-স্বরূপ। ভাবের চৈতন্যময় বিগ্রহ। এ প্রেম-স্বরূপ। অমৃতই তাহার স্বরূপ, — স্বয়ংই। চিন্ময় রাজ্যের ব্যাপার। আর তোমার এই কথা হইল স্বপ্নময় রাজ্যের আলোচনা। হ্যাঁ, আশা, এ আলোচনায় যদি অলোচন গিয়ে স্ব-লোচন খোলে, ভাল কথা। আলোচনা ত অলোচনেরই ব্যাপার, অর্থাৎ অজ্ঞানের।

তাঁহার কথাই, সর্বদা বল না, আগুনের মত ক্রিয়া হবে। না দেখিয়া আগুন ঘাঁটিলেও তো যাহা জ্বলিবার জ্বলে, যাহা গলিবার গলে। স্ব-রসের রাজ্য যেখানে, রস-স্বরূপ, সেই তাঁর স্বরূপ। রস-বিলাস — নিজেকে নিয়াই নিজে। সেই যে অমৃতত্ব। আরে বাবা! হরিনাম

নিয়াই দেখ না — যেখানে মরণ বারণ, সর্ব হরণ, কাল নিবারণ — যেখানে সর্বহরে সেই ত হরিনাম। ভগবানের যে নাম যার ভাল লাগে সেই তার হরিনাম। এই দিকটায় এই বিদ্যাবুদ্ধি, বিচারে চলে না। সেই যে চঞ্চল অচঞ্চল মহাভাবের উন্মাদনা, সে যে কি রস, কিসে বর্ণনা হয় তার! এই দিকেই চোখ দিলে না, মন দিলে না, বুঝবে কি ক'রে বাবা! সে যে কত গম্ভীর রস — গম্ভীর হইতেও গম্ভীর, গম্ভীরতম। অমৃতত্ব আর আত্মস্থ আলাদা নয় রে বাবা।

তোমার কথা ত এই — ভাবেরই অধীন, ভাবেরই উন্মাদনা? হ্যাঁ, ইহারও একটা স্থান আছেই, সেই স্থানে এই কথা ঠিকই। যে ভাব, যে উন্মাদনা, স্বরূপ নয়, অধীনতা — সেই স্থানে এই কথা। বিচার করিয়া দেখ না। যেখানে মন নিয়া, দেহ নিয়া ভাবের অধীনের উন্মাদনা সেখানে ত ঐ কথা ঠিকই। তবে সাধারণের ইহা ধরা কঠিন। হ্যাঁ, যেখানে ধরা পড়িবার সেখানে স্পষ্ট ধরা পড়ে। কোন দিকই বাদ দেওয়ার নয়। বাদ দিলে যে নিজেই বাদ পড়িবে, ফাঁদে পড়িবে। বাদাবাদের পরেও ত। যেখানে আমি কে জানিবার চেষ্টা সেখানে সর্বরূপে অরূপে সেই স্বরূপের প্রকাশ হওয়া চাই না? তাহা না হইলে হইল কি? বাদ গেলে ত বাদেই রহিলে। সব দিকেরই চরম পরম তত্ত্বের প্রকাশ হওয়া চাই। স্বয়ং-স্বরূপ আর কি। দিক, অদিক, বন্ধ নিবন্ধ স্বয়ং-ই।

যে দিকে যে যাইবে, চরম পরম যাহা — আলাদা কোথায়? এ সব একটু ভাব কি? যেখানে আত্মস্থ সেখানে দেখ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সব এক আত্মা। তোমরা বল না — সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। সাকার নিরাকার — জল বরফ যেমন নিত্য সম্বন্ধ। সাকারের ভিতর দিয়া পাইবে নিরাকারও, বরফে জল ধরাই পড়িবে। নিরাকারের ভিতর দিয়া যাইবে — জলই ত বরফ রূপে। আচ্ছা, যেখানে এক আত্মা — অসঙ্গ নিঃসঙ্গ, সেখানে আবার কেন আলাদা ভাবিবে? উহা লাগিবে কি? অতএব তোমার বেদান্তের দিক যাহা বলিতেছ, বাদ হয় কোথায়? ঐ-ত। যে লাইনে যে যাইবে, চরম পরম যাহা মূলতঃ, আর আলাদা কোথায়? রাস্তাতেই ত যত আলাদা আলাদা ব্যাপার। যেহেতু আলাদা আলাদা সংস্কার। এদিকে আত্মারাম স্বরূপ রস যাহা — নিত্য কিনা। কেবল চিন্ময়ই যেখানে সেখানে ভাবিয়া দেখ। যেখানে পূর্ণস্থিতি সেখানে কোন দিকই বাদ হয় কি?

দীক্ষাদানের যোগ্যতা

এক সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন — আমাকে কেহ বলে দীক্ষা দিতে। আমার ত সেই স্থিতি নয়। ইচ্ছাও হইতেছে না। কি করিব? মায়ের কথা — কর্তব্য হইল এই — যেখানে গুরুর আদেশ, সেখানে আদেশ পালন যতটুকু। যেখানে চরম পরম পূর্ণ লক্ষ্যই একমাত্র — সেই যে সাধক, তিনি কখনই গুরুপদ নেবেন না। যেই স্থিতিতে গেলে স্বয়ং গুরুস্থিতি প্রাপ্ত, ইহা ত স্বাভাবিক লভ্য।

নিজের সাধন পরম স্থিতি লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া বা গৌণ করিয়া যদি লোক-কল্যাণ বাসনা প্রধান করিয়া চলিতে চায়, সেখানে সেই শক্তি কোথায়? যেখানে স্ব-শক্তি অর্জন, সেখানেই কল্যাণ, তাহা না হইলে পতন অবশ্যম্ভাবী। যেখানে জাগতিক প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা, আর শিষ্য-পিপাসু — আর চাই অর্থ, সেখানে সব ব্যর্থ। শুধু কি ব্যর্থই, অমৃতের দিকে আর গতি কোথায়?

সাধকের বিভিন্ন দিক

সাধকের কোন সময়ে কাহারও গুরুভাবের একটা অবস্থা আসিতে পারে। মানুষকে শিক্ষা দেওয়া বা মানুষের উপকার করার ভাবটি মানুষের যেমন স্বাভাবিক, তেমন কিন্তু সাধকের জীবনের প্রতি করুণার ভাবটিও স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ হয়। জগৎগুরু নহে কিনা — যেহেতু সাধক সর্ব গুণাতীত নহে, সহানুভূতি স্বাভাবিক — সেই সূত্রে। মহা-করুণার কথা আলাদা। কেহ কেহ আবার গুরুভাবের অবস্থায় আসিলেও সে তাহাতে উদাসীন থাকিয়া আপন লক্ষ্যানুযায়ী কর্মাদি রীতিমত সম্পাদন করিয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিবার চেষ্টা করে। প্রকৃত সাধকের রাস্তায় যে সব উন্নত বা অলৌকিক অবস্থা আসে, আপনা আপনি প্রকাশ পায়, সেইগুলি সে দেখিতে যায়। সব সময়ই এক ভগবৎ সত্ত্বায় নিজেকে হারাইবার জন্য আপনাকে তৈয়ার করে — 'আমি' 'আমি' করিয়াই হউক নয়ত 'তুমি' 'তুমি' করিয়াই হউক।

ইহার ভিতর আর একটি বিষয় আছে। কেহ হয়ত যে কোন রাস্তায় গিয়া ঘাট থাক বা না থাক, রাস্তা দেখুক বা না দেখুক,

গঙ্গায় কোনরূপে ডুব দিয়া আসিল। আবার কেহ রাস্তাঘাট সব দেখিয়া শুনিয়া প্রসিদ্ধ ঘাটে গিয়া রীতিমত স্নান করিয়া আসিল। এই দুইয়ের ভিতর প্রভেদ রহিয়াছে। কেননা প্রথম ব্যক্তির স্নানের পরও যদি বিশেষ ঘাটের সংস্কার থাকিয়া যায়, অর্থাৎ ঘাটের মহত্ত্বের গুণের অভাব, তাহার সংস্কার মুক্ত হইবার প্রয়োজন হইবে। কারণ তাহার বিশেষ ঘাটে ডুব দেওয়া হইল না। তাহা ছাড়া রাস্তা ঘাটও অজানা রহিল কিনা। দ্বিতীয় ব্যক্তির ইহার প্রয়োজন হইবে না। আসল ডুব হইয়া গেলে সেখানে আর কোন প্রশ্ন নাই।

সাধকের সর্বশক্তি ও সর্ব প্রকাশটা হইতে গেলে তাহাকে সকল বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা দরকার, যে কোন রূপেই হউক। তাই দেখ, গঙ্গার স্রোত সব জায়গায় থাকিলেও হরিদ্বার ব্রহ্মকুণ্ডে এত ভীড়। যে স্থানেই হউক, সব স্থানেই সব ত আছে। এই ভাব প্রকাশ হইলে আর কথা থাকে না। এক রাজা সম্রাট হইয়া যেখানে যত রাজা আছে সকলের খবর রাখে। যে সর্বজ্ঞ, সে সকলকে শিক্ষা দিলেও তাহার তো আর আলাদা কোথাও নাই, বাধাও নাই, নাইও নাই। তাহার আর বন্ধনের প্রশ্ন কোথায়? সাধকের এক অবস্থা আসে, যখন তাহার ভিতর উদয় হয়, সে সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং তাহাতে সব, সবেতে সেই। আবার যেখানে সাধক সব কিছু হইয়াও সেই একমাত্র। তাহার ভিতর তখন থাকে না যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাও আমি, উহাও আমি বা আমিই সব। বাদ কিন্তু কিছুই যায় না।

খণ্ড খণ্ড ভাবে নিজেতে প্রতীয়মান হওয়া পর্যন্ত বুঝিতে হইবে, সে তখনও খণ্ড ভাবে আবদ্ধ। সর্বজ্ঞ পূর্ণাঙ্গীন নয়। শুধু জ্ঞানলাভ করিলেই হইল না, জ্ঞান-অজ্ঞানের পরপারে যাইতে হইবে। যে সাধক, সাধনা করিতে করিতে, উন্নত হইয়া সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে 'সে-ই' বলা যাইতে পারে কি? কেননা ভগবান তো অদ্বিতীয় অভিন্নও ত বটে। প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির পারে যেখানে, সেখানে ত আর কোন প্রশ্নই উঠে না। তাহাকে কি করিয়া বুঝাইলে যে বুঝান যাইতে পারে, তাহা ভাষায়ও প্রকাশ করা হয় না।

আবার কোন দৃষ্টিতে ভগবানের অবতার যে বলা হয়, তাহাও কেহ কেহ বলে এক দিকের কথা। ইহাও সত্য। আবার এক দিকের কথা বলিয়াও কিন্তু কোন কথাই নাই। সবখানে, সব সময়ই যে সেই পূর্ণই স্বয়ং-প্রকাশ।

যাহাকে রূপ-অরূপ, ক্রিয়া-অক্রিয়া, ক্রম-অক্রম, আসা-যাওয়া, নামা-ওঠা, কোন বিষয় ধরিয়া ভাষায় বোঝানো যায় না। অবতার গতাগতির দৃষ্টিতে তাঁহার ব্যবহার দেখায় মাত্র। এইসব করিলেও তিনি সেই। যখন এক ভিন্ন অন্য আর কিছুই নাই তখন তাঁহাকে আলাদা কোন সংজ্ঞা দিলে তিনি খণ্ড হইয়া পড়েন — ইহা এই দৃষ্টির কথা বুঝায় নাকি? খণ্ডেই খণ্ডের কথা বলে। তিনি ত অখণ্ড, খণ্ড বলিলেও খণ্ডিত হন না।

কিন্তু আবার যেমন ফল থাকিলে তাহার বীজটিও সঙ্গে, পাতা বলিলে তাহার আকারও সঙ্গে থাকে, ঠিক তেমনই — তাঁহাকে খণ্ড হইয়া পড়েন বলিলেও সেইরূপে তিনি সর্বত্র সকলের সঙ্গে, সর্বক্ষণ ওতঃপ্রোত ভাবে মিলিয়া মিশিয়া আছেন। আবার যে তিনিই একমাত্র আছেন। দুইয়েতে সেই এক-ই। যেমন তোমরা বল একে একে — একই। মিলিয়া মিশিবার প্রশ্নই বা কোথায়? ক্ষণই বা কোথায়? সেখানে আর কেউ বা কে? কাহার সঙ্গে মিলিবে? খণ্ডভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ সাধক তাঁহাকে সেইরূপে দর্শন করে। কল্যাণ-অকল্যাণ, কর্ম-অকর্ম লক্ষণ কি তাহাতে আছে? তোদের এই দৃষ্টি যতক্ষণ, বিচার ত ততক্ষণই। আবার সবই যে তাঁহাতে।

তবে আর একটি কথা এই যে — সব সময় তিনিই তাঁহাতে অবতরণ করিতেছেন। তিনিই সাধক রূপে পূর্ণ হইতেছেন, আবার বিশেষরূপে তিনিই অবতরণ করিতেছেন — বাস্তবিক সত্য। করুণা, কল্যাণ ইত্যাদি যাহা তাহাও তাঁহাতে, ইহা সত্য জানিস।

আবার তিনি কিছু করেন না। তাঁহাতে কিছু নাই। যুগপৎ সব কিছু আছেও, নাইও। আবার নাই ও না, আছেও না। যা বল তাই — ঐ-ই। একাধারে তিনিই সব — যে কোন আকার প্রকারই মান, আবার নিরাকারই মান। দিন-রাত্রি, সন্ধ্যা-সকাল, জ্যোৎস্না-অন্ধকার, যাহা কিছু হউক না কেন — শূন্য আকাশ, যাহা কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না, সেইরূপ তাঁহারও কোন পরিবর্তন নাই। তাঁহাতে শুকাইবার বা সরাইবার কোন স্থান নাই। গতাগতিও নাই। আসেও না — যায়ও না।

ইহাও সত্য যে জগতের যখন দরকার হয় তখন তিনি যে ভাবে বুঝাইলে বুঝিবে সেই ধরণের জীব উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন, প্রকাশ হন দেখা যায়। কারণ যে যেমন, তাহার তেমন বিষয় না হইলে

সে ধরিতে পারে না ত। জগৎটাই বা কি ? গতাগতিটাই বা কি ? ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলেই সব পাওয়া। নিজেকে পাইলেই সব পাওয়া। তাই সময়ানুযায়ী তাঁহার দর্শন। আবার ইহাও কেহ বলে যে তাঁহার অনন্ত লীলা। তিনি ইচ্ছাময়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় জীব উদ্ধারের জন্য করুণায় প্রকাশিত হন — ইহাও সত্য। আবার এ কথাও বলে — ইচ্ছা অনিচ্ছার ভিতর আছ বলিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদের এইরূপ ভাব উদয় হয়। ইহাও ঠিক — যেমন ভাব তেমন লাভ। এই শরীরের কথা ইহাও — ইচ্ছা অনিচ্ছা আবার ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই নাই — এ সবই কিন্তু তাঁহারই পূর্ণতায়।

অবতারদের এই যে লৌকিক কর্মের মত দেখায় বলিলে, জীব উদ্ধার করা, ভগবান অবতার রূপেতে যখন প্রকাশ হন বল, তাহার ভিতর ভগবত্বার খেলা যুগপৎ দেখা যায়। তাঁহার অলৌকিক গুণ, নানা ভাবে স্বাভাবিক প্রকাশ পায়। তাঁহার সকল কর্মই তাঁহাতে পূর্ণ থাকে। তাঁহার মায়ার ক্ষমতার খেলায়ও পূর্ণ। প্রকাশ ত সেই পূর্ণই। নিজেই স্বয়ং বিভূতিস্বরূপ। ইহার সাথে আর বিভূতি প্রাপ্ত না। সব সময়ই জীব-যোগে আপন ভাবে খেলিয়া থাকেন। ধরা না দিলে কেহ ধরিতে পারে না। সাধকের যে জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ইত্যাদির মধ্যে যে যে পথ, অর্থাৎ যত মত তত পথ, সেই অনুযায়ী যে কি সুন্দর, অক্ষুণ্ণ সবই আছে।

কেহ জিজ্ঞাসা করিল — এই যে গাছটি দেখা যাইতেছে ইহা কি ভগবান ? তখন বলা হইল — গাছ কি কখনও ভগবান হইতে পারে ? যখন গাছ-পাতার বুদ্ধিতে দেখিবে, তখন আর ভগবান দেখা হয় না। আবার এক ভগবান যখন দেখিবে, তখন আর গাছ পাতা দেখিবে না। তবে আবার একটা ভাব প্রবল হইলে দেখিবে এই গাছ পাতাও তাঁহারই এক রূপ। সেই ভাব ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করে।

গুরুকেও মানুষ বুদ্ধি দেখিলে অন্যায় হয় জানিবে। যেমন বিগ্রহ, শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ ইত্যাদিতে শিলাবুদ্ধি রাখিলে অন্যায় হয়। ইষ্ট, গুরু, মন্ত্র এক করিয়া দেখিবে। এক তিনিই স্বয়ং ইষ্ট, গুরু ও মন্ত্ররূপে প্রকাশিত হন। তিনেই এক একেই তিন। যেমন বলা হয় — আমার গুরু যিনি, জগতের গুরুও তিনি। জগতের গুরু

যিনি আমার গুরুও তিনিই। যিনি ইষ্ট তিনিই এইরূপে গুরু। গুরুতে ইষ্ট, ইষ্টতে গুরু। যখন উন্নতি লাভ হয় তখন আর 'তে' নাই — তিনি-ই একমাত্র স্বয়ংই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সেই ইষ্ট গুরু। ইষ্ট গুরু যিনি, তিনিই সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মনে করিতে হয়। ক্রমে প্রকাশ্ — একমাত্র ঐ-ই।

ইষ্ট কে ? যেখানে অনিষ্ট নাই, যেখানে অনিষ্ট হয় না, তিনিই একমাত্র ইষ্ট। গুরুরূপে প্রকাশিত হইয়া যেমনটি হইলে আপনাকে পাওয়া। আপন একমাত্র সে-ই, ভগবান ইষ্ট — যার যার ধ্যেয়। আত্মস্থই বল আর সগুণ, সাকার, রূপমাত্রেরই বল — যা নিত্য স্বয়ং-প্রকাশ। তিনি আবার কি করিয়া প্রকাশ ? সেই রাস্তায় যিনি হাত ধরিয়া লইয়া যান, তিনিই গুরু।

এই যে বলে — যাহা কিছু দেখ, এ সব তিনি নয়। তাহা কেন বলে ? যে বিচারে বিচারক যোগী হইবে সে, জগৎ দৃশ্য যাহা আছে, তাহা নেতি নেতির অর্থাৎ 'এ সে নয়', 'এ সে নয়' ভাবে দেখে বলিয়াই এইরূপ বলে। অর্থাৎ ঐখানে ঐ দৃষ্টিতে ঐ রূপই যে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে — যে পর্যন্ত কোন বিষয়ের গতাগতির পরিবর্তন আছে, তাহা কি করিয়া সে-ই নিত্য হয় ? তাই যতক্ষণ সে শুধু গতাগতির দৃষ্টিতে দেখে, ততক্ষণ ঐ কথাই বলে। পরে বিচার করিতে করিতে বিচারকের গতি যখন সর্ব সংস্কারের মূলোচ্ছেদ হইয়া একাগ্রতা ও পরিপুষ্টি লাভ করে, তখন একাত্ম, এক আত্মা, যা — তাই, আর কোন প্রশ্ন নাই। একাগ্র মানে কি ? মন বহু অগ্র নিয়া ত ! যে মুহূর্তে আসল একাগ্র হইল, অর্থাৎ স্থিতি লাভ করিল, তখনই সে মূলে, আর মূল কাহাকে বলিবে ? স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ত আলাদা দৃষ্টি মাত্র। যাহা আছে মূলে তাহাই ত স্থূলে, যাহা স্থূলে তাহাই ত মূলে। কি রকম সেটা ? শোন, তোরা গাছের গোড়াটা দেখিয়া জল দিলি, বেশ গাছটা তাজা হইল, বড়সড় পাতায় ফুলে ফলে সজ্জিত। ফলটি যখন পাকিল, বেশ সুন্দর। অমৃতত্ব বাহির কর। বীজটি যে পাকিল, যেখানে না, সেখানে অমৃতত্ব ত ? অমৃতত্ব কি ? সে কি দিল ? বীজ দিল। ঐ গাছের মৃত্যু হইল না। তখন আর একটা পাইলে ত। কাপড় বদলান মাত্র — সেই বীজ ও বৃক্ষত্বও ত। আত্মার ধ্বংস নাই, দৃষ্টি সৃষ্টির গতিতে এই পরিবর্তন দেখিলে মাত্র।

মৃত্যু কোথায় ? পুনর্জন্মই বা কোথায় ? তুমি ছোট্ট শিশু ছিলে এই যে বদলাইয়া গেলে। মৃত্যু যদি বল তবে ত পুনর্জন্ম, মৃত্যু সব সময়ই হইতেছে। তোমার শিশুত্ব উপস্থিত যে বৃদ্ধত্বের দিকে। এইটি তন্ন তন্ন করিয়া আলাদা যেমনটি যেখানে — আছেই ত। এই স্থলেও আবার নাই। এটা তোদের দৃষ্টিতে ত। কোথায় জন্ম, কোথায় মৃত্যু — আসলে সেখানে জন্ম-মৃত্যু, আসা-যাওয়ার প্রশ্ন কোথায় ?

বীজ যখন পাইলে — কোথায় খুঁজিয়া দেখ গাছের কোন অংশ ইহা হইতে পারে না ? আচ্ছা, এই যে তোরা কলম কাটিস্ কোন জায়গায় শিকড়টা নাই, বাহির কর। এখানে গতি স্থিতি, পরিবর্তন অপরিবর্তনে কে গো ? খোঁজ।

প্রঃ — এ'টা সে'টা কোথায় থাকে ? এটাও, সেটাও — সে-ই ?

মা — সে-টা বন্ধনে থাকে, একদেশ দৃষ্টিতে থাকে। যেখানে দৃষ্টি-সৃষ্টি, গতি-স্থিতি আলাদা করিয়া যাহার কাছে, তাহাকেই বলে জীব।

মন যখন মূলে, তখন কি আর এ-কূল ও-কূল দুকূলে ? সে অবস্থায় বরফ গলিয়া জলে মিশিয়া যাওয়ার মতন, তাহাতে তাহার স্থিতি হয় বলিয়া তাহার আর ভিন্ন দৃষ্টি থাকে না।

মায়া ও জ্ঞান

মায়া শব্দ — মে আয়া অর্থাৎ আমি আসিয়াছি, আমি যাই, এই ত। আসা যাওয়া একই কথা। ঘর বুদ্ধিটা আর কি। যেখান হইতে আসা, সেইখানেই যাওয়া অর্থাৎ আসা। আসা থাকিলেই যাওয়া আছে যাওয়া থাকিলেই আসা আছে। কারণ ঐ ঘর হইতে এ ঘরে আসিয়াছি। ইহার অর্থ হইল — ঐখান হইতে চলিয়া গিয়া এইখানে আসিয়াছি। মায়ার আর একটি অর্থ — এই দেখা যায়, এই দেখা যায় না — যেখানে দৃষ্টি। এই গতাগতি মায়া রূপেতেও অনাদি — শান্ত। তোমরা বল না যেমন কোন সময় আমগাছ সৃষ্টি হইয়াছে, কি করিয়া তাহার বীজ এতদিন রক্ষা হইয়া আসিয়াছে। বলিতে ~~হয়~~ প্রকৃতির খেলা এইরূপ চলিয়া থাকে। কিন্তু সাধক প্রকৃতির উপর না গেলে এক লক্ষপতিটিকে কি বুঝিতে পারে — এই ত প্রকাশ। আত্মার ধ্বংস নাই ত। তোমরা বল না, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-শাশ্বত। যাহা পরিবর্তনশীল, গতাগতি তাহাকেই ধ্বংস বলে — যেখানে আসা যাওয়া, জন্ম মৃত্যু।

যাহা নয়, কিন্তু সত্য বলিয়া যে মনে হয়, এই যে ভ্রম ভ্রান্তি, মিথ্যা অসত্য — মনের ব্যাপার। ব্যাপার মানে — এপার ওপার আছে। সবের পারে নয় — যেখানে পারাপারের প্রশ্ন নাই, নিত্য অপ্রাকৃত লীলা যেখানে। নিত্য যদি রাখ, অনিত্যের স্থান কোথায়, এ প্রকৃতির স্থান কোথায় ?

সত্য যেখানে নিত্য প্রকাশিত — ইহা যেখানে, সেখানে মায়ার স্থান কোথায় ? সেই জন্যই কোন জায়গার কথা, তাঁহারই মায়া, যোগ দুই — অর্থাৎ সৃষ্টি যেখানে। কেবল পড়াশুনাতেই মূল জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। পরম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভূতি করিতে হইলে সর্বক্ষণ ঐ কর্মে লাগিয়া থাকাই আবশ্যক। আবার জ্ঞান কিন্তু স্বয়ং-প্রকাশ, কোন কর্মের অপেক্ষা রাখে না।

সংসারে আদেশ পালন

দেখ, সংসার ত 'সংই — সার'। সং সাজা বই ত নয়। সংটাকে সার বলিয়া বসিয়া থাকা হয় বলিয়াই যত দুঃখ কষ্ট। একটা কথা মনে রাখিও যে সংসারে সত্যনিষ্ঠভাবে কর্মাদি করিলেও সকলের মনের গতি সমান নয় বলিয়া, যার যার নিজের মনের ভাব অনুযায়ী ধারণায় অপরের কর্মগুলি গ্রহণ হয়। তাই যে কাজ করে, সর্ব সময় সে প্রশংসাভাজন হয় না। সংসারের ন্যায়-অন্যায় না দেখিয়া অনেক সময় ছোটদের উপর মন্দ ব্যবহার হয়। ইহা পরে কেহ কেহ বোঝে, কেহ কেহ বোঝেও না। আবার অপর কেহ বুঝিলেও স্বীকার করে না। কিন্তু যখন আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইবে, সে সময় অবিচারে সত্য ভাব বজায় রাখিয়া কেবল আদেশের উপর নির্ভর করিয়া সকল কাজ অম্লান বদনে করিয়া যাইবে। উপর-ওয়ালা কোন চোখে দেখিল এইসব কখনও ভাবিবে না। কারণ উপরওয়ালার বিচার করিবার তোমার কোন অধিকার নাই। হাসি-মুখে আদেশ পালন করাই তোমার করণীয়। মনে দুঃখ রাখিয়া কোন কাজ করিবে না। তাহা হইলে কর্ম সুচারুরূপে শুদ্ধ হয় না।

আর মনটাও মলিন হইয়া যায়। তাই কর্তব্য হইতেছে যে সর্বক্ষণ আনন্দে আদেশ পালন করিয়া যাওয়া।

ভোলানাথের আদেশ নির্বিচারে পালন

আমরা ঢাকা গেলে একদিন সকালে ননীবাবু বাগানে বেড়াইতে আসে ও ভোলানাথের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। এই শরীরের কথা তাহার সহিত আলোচনা হইলে সে এই শরীরটার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। এক সন্ধ্যাবেলা ননীবাবু ও প্রাণগোপালবাবু আসিল আর এ শরীরের কুণ্ডলী অবস্থায় তাহাদের সহিত কথাবার্তা হইবার পর তাহারা স্থির ভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া চলিয়া গেল। সে সময় হইতে ৬/৭ দিন পর পর সন্ধ্যার সময় তাহারা আসিয়া আপন মনে এই শরীরটার সামনে বসিয়া থাকিত।

প্রাণগোপালবাবু ধর্মপ্রাণ লোক। তাহারা উভয়ে বলে এখানে আসিলে স্থির ভাবে জপ চলে। এ শরীর যখন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ী যাইত তাহারাও মাঝে মাঝে যাইত। একদিন সন্ধ্যায় আমি ও ভোলানাথ সিদ্ধেশ্বরী গেলাম, তাহারা দুইজনও ছিল। রাত্রি সেইখানেই শেষ হইল। প্রাণগোপালবাবু ফিরিবার পথে বলিল যে ধর্ম করিতে রাত ভোর করা আমার জীবনে এই প্রথম।

বাহিরের কাহারো সামনে বাহির হওয়া সম্বন্ধে তখন এ শরীর আপত্তি করিত, কোথাও যাওয়া আগেও এ শরীরের খেয়াল হইত না — ভোলানাথ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। এই সব বিষয়ে তাঁহার মত অনুযায়ীই যতটুকু পারিতাম চলিতাম। একদিন ভোলানাথের সম্পর্কিত একজন আত্মীয় আমাকে কথায় কথায় বলিল — আপনি যে ভোলানাথ যাহা বলিবে, তাহাই শুনিবেন এমন কি কথা আছে। তিনি যদি আপনাকে খারাপ কিছু করিতে বলেন, আপনি কি তাহাই করিবেন ? আপনার নিজের কি বুদ্ধি বিচার নাই। এ শরীর বলিল — এ শরীরটার গতি ঐ সব ভাবিবার দিকই না। কেবল আদেশ পালন করিয়া যাওয়া, এই শরীরটার যতটুকু আসে। ঐ সময় উপস্থিত হইলে কি হইবে এখন বলা আসিতেছে না। সে শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গৃহকর্মে ভাবাবেশ

এ শরীরের তিন গ্রাস প্রাতে ও তিন গ্রাস রাত্রে, খাওয়ার ব্যবস্থাও সমানে আছে। আশু ও মাখন সাহবাগে ছিল। সকালে ছেলেদের জন্য রান্না ও তাহাদের খাওয়া হইয়া গেলে বাসনাদি পরিষ্কার করিয়া, স্নান করিয়া পুনরায় রান্না হইত। ভোগ নিবেদন হইয়া গেলে ভোলানাথ আহার করিত। ডাল চাল এক একটি করিয়া বাছা হইত, চাকর বাসন ধুইলে আবার নিজ হাতে ধোয়া হইত, সকলের জন্য পাক, খাওয়ান, পুকুর হইতে নিজে জল আনিয়া ভোগের রান্নাবান্না করা ও অন্যান্য গৃহকর্মাদি সমস্তই একা করিতাম। এ সকল কর্মাদি করিতে করিতে কতবার যে মাটিতে কত সময় পড়িয়া থাকিতাম তাহার ইয়ত্তা নাই। কখন দেখা গিয়াছে, তরকারি কুটিতে কুটিতে দা'এর উপর হাত পড়িয়া আছে। আবার যখন উঠিতাম তখন সে কাজ শেষ করিতাম। রান্না করিবার সময় চুলার লাকড়ি টানিয়া দিতে গিয়া হাত ঐখানেই পড়িয়া থাকিত। অনেক সময় হাতে আগুনের তাপও লাগিত, পরে উঠিয়া দেখিতে পাইতাম কিন্তু পোড়ার জ্বালা বোধের প্রকাশই কোথায় ? কে করে ?

কোন কোন দিন আগুন নিবিয়া রান্নার জিনিষাদি পোড়া, কাঁচা, আধা বা বেশী সিদ্ধ হইয়া থাকিত। ঢুলিতে ঢুলিতে যাইয়া আবার সে সব ঠিক করিয়া তৈয়ারী করিতে করিতে ভোলানাথের খাওয়ার অনেক দেরী হইয়া যাইত। ভোলানাথ জানিত যে এ শরীর ইচ্ছা করিয়া এইরূপ দেরী করে না, যথাসাধ্য সব কাজ সুন্দরমত করিতে চেষ্টা করে কিন্তু সেই সময় আর হইয়া উঠিত না। কি এক মহা নেশায় পড়িয়া থাকা। অবস্থাটি যেন ক্রমশঃ একটু বাড়াবাড়ি হইতে লাগিল।